



**Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)**

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 140 - 153

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: [editor@tirj.org.in](mailto:editor@tirj.org.in)

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

## সমরেশ মজুমদারের গল্প : প্রসঙ্গ উত্তরবঙ্গ

ড. রমা দাস

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: [ramadas.mtb@gmail.com](mailto:ramadas.mtb@gmail.com)



ও

অনন্ত বর্মণ

গবেষক, বাংলা বিভাগ

গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: [ananta1992.com@gmail.com](mailto:ananta1992.com@gmail.com)



0009-0009-4508-0087

**Received Date 20. 01. 2026**

**Selection Date 10. 02. 2026**

### Keyword

Uttarbanga,  
tea garden,  
teesta, forest,  
language,  
place-name,  
social life,  
lower-middle  
class,

### Abstract

Samaresh Majumdar entered the world of writing with the publication of his short story 'Antaratma' (1967) in desh patrika. Subsequently, he became a renowned writer of Bengali fiction. In addition to timeless novels like 'Uttaradhikar', 'Kalbela', 'Kalpurush' trilogy novels and 'Satkahan', he also wrote numerous short stories. In his stories, on the one hand, the life of the metropolis and on the other hand, the people of North Bengal have repeatedly come up. The author spent his childhood in Dooars in North Bengal. As result the tea gardens of Dooars, the jungle of Khutumari, the jungle of Chapramari, the Angravasa river, the Teesta river are present in his stories. He has also highlighted the life of the Madeshiya workers of the Dooars tea gardens and the culture of the tea gardens in the stories 'Zayga', 'Tritiy Nayan' and 'Jaler Pran'. He has also expressed the struggling life of the lower class people on the banks of the Teesta River in his stories 'Janani', 'Char, Shahar and Ekti Bekuf' and 'Annaprashan'. He has not only talked about the life of the lower class, but also shown them the way to hope for survival. In his story 'Octopus' the solidarity of humans with the wild animal elephant is found. He has repeatedly returned to North Bengal in choosing the subject of his stories. Because North Bengal was the pull of his soul. His stories, on the one hand, depict the struggling lives of various tribes of North Bengal and on the other hand, their use of language. The author was aware of the times. As a result, the touch of modernity and change is noticeable in his stories. Innovative social thinking is one of the aspects of his stories. He never thought about the form of the story, rather the subject of the story inspired him to write.

**Discussion**

সত্তরের দশক-এর পরবর্তী বাংলা কথাসাহিত্যের জগতে অন্যতম বিশিষ্ট লেখক হলেন সমরেশ মজুমদার। তিনি ষাট ও সত্তর দশকের বাস্তব চিত্রকে গল্প ও উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। সেই সময় শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক মিত্র, রমাপদ চৌধুরী প্রমুখ কথাসাহিত্যিকরা ছিলেন সমসাময়িক একই ঘরানার লেখক। কথাসাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের শৈশব কেটেছে ডুয়ার্সের চা-বাগানে, আংরাভাসা নদীতে, খুঁটিমারীর জঙ্গলে খেলাধুলা করে। জন্ম ১০ মার্চ ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দে জলপাইগুড়ি জেলা গয়েরকাঁটা চা-বাগানে। তাঁর পিতামহ চার বছর বয়সে তাঁকে জলপাইগুড়ির বাড়িতে পড়াশোনার জন্য নিয়ে আসেন। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতায় চলে আসেন। তিনি স্কুল জীবন থেকে লেখালেখি শুরু করেন। প্রথমে নাটক নিয়ে চর্চা করেন। দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় মাস্টারমশায়ের উৎসাহে ‘নাজলী’ নামে একটি গল্প লেখেন। তিনি গল্পটির বিষয়ে উৎসাহী ছিলেন না। ফলে তাঁর প্রথম সফল গল্প ‘অন্তর আত্মা’ ১৯৬৭ সালে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেই সময় থেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত অসংখ্য গল্প উপন্যাস রচনা করেছেন। তাঁর লেখায় উত্তরবঙ্গের নদী, চা-বাগান, জঙ্গলের প্রসঙ্গ বারবার ঘুরেফিরে এসেছে। শৈশব থেকেই চা-বাগান ছিল তাঁর কাছে প্রিয়। সেই চা-বাগানের স্মৃতি মনে রাখার জন্য চা-বাগানের মাটি জলপাইগুড়ির বাড়িতে এনেছিলেন। আর সেই মাটি দেখলেই তাঁর মনে হয় তিনি চা-বাগানেই আছেন। তিনি তাঁর গল্প লেখা সম্পর্কে জানিয়েছেন-

“জীবন স্থায়ী করেছে ডুয়ার্সের চা-বাগানে, জলপাইগুড়ি শহরের তিস্তা নদীর পাশে। সেই সব জায়গায় কত গল্প ছড়িয়ে ছিল, তারা বারংবার আমার কলমে উঠে এসেছে। যা দেখেছি মন দিয়ে জেনেছি তাই লিখতে আমার স্বস্তি।”<sup>১</sup> (সমরেশের সেরা ১০১, নিবেদন অংশ)

শৈশবে দেখা চা-বাগান, নদী, জঙ্গলের স্মৃতি তিনি বহু গল্পে উপস্থাপন করেছেন। চা-বাগানের পাশাপাশি আংরাভাসা নদীও তাঁর প্রিয় সঙ্গী ছিল। ফলে সমরেশ মজুমদারের বিভিন্ন গল্পে কীভাবে উত্তরবঙ্গ একটি চরিত্র হয়ে ওঠে সেটা অন্বেষণ করাই আমাদের এই প্রবন্ধের প্রধান দিক।

**১**

লেখকের বহু গল্পে চা-বাগানের প্রসঙ্গ আছে। উত্তরবঙ্গের গল্প-ভূবনে চা-সংস্কৃতি অন্যতম একটি দিক। সমরেশ মজুমদারের গল্পে চা-প্রসঙ্গের দিকটি বিশ্লেষণ করার পূর্বে উত্তরবঙ্গের চা-ইতিহাস সম্পর্কে দু-চারটি কথা বলা প্রয়োজন। উত্তরবঙ্গের ডুয়ার্সের ভূ-প্রকৃতি স্যাঁতসেঁতে, জঙ্গলাকীর্ণ এবং বসবাসের অনুযোগী হওয়ায় ব্রিটিশ সরকার ১৮৭৪ সালে এই অঞ্চলের চা-বাগান গড়ে তোলেন। এই অঞ্চলে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসবাস করে। তারা জঙ্গল কেটে চা-বাগান গড়ে তোলার ব্যাপারে উৎসাহী ছিলেন না। ফলে তারা চা-বাগানে কাজ করতে চাননি। ইংরেজ চা-কর আরকাটি বা দালালদের মাধ্যমে বিহার, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, তৎকালীন বঙ্গদেশের পূর্ব ও পশ্চিম থেকে লোক এনে চা-বাগানের কাজে লাগান। ধীরে ধীরে বাঙালিরাও চা-বাগানের কাজে যুক্ত হন। সেই সময় চা-বাগানের ম্যানেজারদের কঠোর নিয়ম কানুন পালন করতে হত। সময়-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে চা-বাগান এলাকার পরিবর্তন ঘটে। এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল ‘জায়গা’। এই গল্পে চা-বাগানের মাঝখানে ছিল আসাম হাইওয়ে রাস্তা। লেখক জানিয়েছেন -

“চা-বাগানের শেষ সীমা থেকে শুরু হয়েছে খুঁটিমারীর জঙ্গল। এককালে ভর-বিকলে বাঘেরা এই রাস্তায় নেমে এসে গা চাটত। চা-বাগানের শরীর জড়িয়ে আংরাভাসা নদী, যার গায়ে কুলি লাইন। এককালে রাঁচি আর হাজারীবাগের বাসিন্দারা এখন এখানকার মাটির মানুষ হয়ে গিয়েছে।”<sup>২</sup>

জনবসতি কম তাই জায়গাটি নিস্তদ্ধ। শুধু ঘুঘু আর মোরগের ডাক শোনা যায়। চা-বাগানের মুখে বাঙালি বাবুদের কোয়ার্টার। এই বাঙালি বাবুরা মূলত চা-বাগানের কেরানি বা হিসাব রক্ষকের কাজ করে। চা-বাগানের কোয়ার্টারগুলো যেখানে শেষ হয়েছে সেখান থেকে বাজার শুরু। মদেশিয়ারা বাজারে শাক সবজি বিক্রি করে। মদেশিয়ারা হল চা-বাগানের শ্রমিক। ইংরেজ চা-কর বাইরে থেকে আদিবাসীদের চা-বাগানের শ্রমিকের কাজে এনেছেন। এরাই মদেশিয়া নামে পরিচিত। সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার পরিবেশ বদলে যায়। এই গল্পে সুধাংশু ও গাঙ্গুলিদের বড়কর্তা হরিহর তা মেনে নিতে

পারে না। উত্তরবঙ্গের একটি বহুল প্রচলিত শব্দ হল বড়কর্তা অর্থাৎ যিনি পরিবারের প্রধান ব্যক্তি বা যাকে সবাই সম্মান করেন। বড়কর্তা হরিহর বলে -

“নতুন লোকজন আসছে, ছেলেমেয়েদের চালচলন যেন কেমন। জায়গাটা পাল্টে যাচ্ছে দাদা, বড় কষ্ট হয়। মানে নিজেদের তৈরি জায়গা তো।”<sup>৩</sup>

এমনকি হরিহরের নাতনিও মেমসাহেবের মত বেলবটম পরে কোমর দুলিয়ে হাটতে চায়। আসলে হরিহরের ভাবনা কলকাতায় গেলে নাকি চরিত্রহানি হয়। আর এদিকে চা-বাগানের এলাকাটাই কলকাতার মতো হয়েছে। তাই হরিহর এই পরিবর্তন মেনে নিতে পারে না বলেই আর বেঁচে থাকতে চায় না। সুধাংশু বলে -

“ও হরি, আরও ক’টা দিন যে বেঁচে থাকতে হয়। এখানে বার হবে, নাচ হবে সন্ধেবেলায় বেলেল্লাপনায় ছেয়ে যাবে রাস্তার তে মাথা - বাঃ বাঃ, তুমি আবার মরতে চাও! ছি!”<sup>৪</sup>

আসলে লেখক চা-বাগান এলাকার পরিবর্তন, আধুনিকতার ছোঁয়ায় বাজার ও মানুষের পরিবর্তন দেখাতে চেয়েছেন।

‘তৃতীয় নয়ন’ গল্পে অস্তুর শৈশব কেটেছে পলাশপুরের চা বাগানে। লেখক অস্তুর মধ্যদিয়ে নিজের শৈশব জীবনের চিত্র অঙ্কন করেছেন। অস্তুর ঠাকুরদা পলাশপুর টি স্টেটে চাকরি করতেন। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে জলপাইগুড়িতে বাড়ি করেন। অস্তুর ও দিদি ভাই ঠাকুরদার সঙ্গে জলপাইগুড়িতে থাকে। পলাশপুর চা-বাগানের কোয়ার্টারে বারোয়ারি কালি পূজা হত। ঠাকুরদা যেবার চা-বাগানের বারোয়ারি কালি পূজার সেক্রেটারি ছিলেন সেবার শ্রীচরণ ঠাকুর গড়ার বায়না পায়। সেই বারোয়ারি কালি ঠাকুরের প্রসাদ দিয়ে অস্তুর অন্নপ্রাশন হয়। এবার কালি পূজার একদিন আগে ঠাকুরদা অস্তুর ও তার দিদিকে পলাশপুরের বাসে তুলে দেয়। বাস থামতেই কণ্ঠস্বর চিৎকার করে ময়নাগুড়ি, ধূপগুড়ি, গয়েরকাটা তার পরেই দেখা যায় -

“সবুজ গালিচার মতো ছাঁটা চা-গাছগুলোর মধ্যে নীল রঙের জমিতে সাদা রঙে ‘পলাশপুর টি এস্টেট’ লেখা সাইনবোর্ডটা চোখে পড়তেই বুকের ভেতরটা ছটফট করে উঠত।”<sup>৫</sup>

অস্তুর বাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধুদের কাছে পায়। কোয়ার্টারের ফাঁকা মাঠে মগুপ ও সোনাদের কোয়ার্টারের পাশে ঠাকুর তৈরির কাজ চলে। শ্রীচরণ চা-বাগানের প্রতিটি পূজার ঠাকুর তৈরি করে। শ্রীচরণের খাবার দায়িত্ব প্রতি কোয়ার্টারে একদিন করে। ডিউটিতে যাবার সময় বাবুরা শ্রীচরণকে বলে -

“শ্রীচরণ, এবার যেন ঠাকুরের চোখ সুন্দর হয়, গতবারটা যা টেড়া করেছিলে।”<sup>৬</sup>

পলাশপুর এলেই অস্তুর মন খুশিতে টকবক করত। পলাশপুরের চা-বাগান, মন্টু, বুনু, বিশু, সোনারা ছিল তার খেলার সাথি। তাই অস্তুর এই স্মৃতি মনে করার জন্য কৌটোতে করে চা-বাগানের মাটি জলপাইগুড়ি নিয়ে যায়। প্রতিদিন একবার করে দেখে তার মনে হত সে চা-বাগানেই আছে, মন্টুদের পাশেই আছে।

‘জলের প্রাণ’ গল্পে চা-বাগানের মালিক চা-ফ্যাক্টরির মেশিন চালানোর জন্য আংরাভাসা নদী থেকে খাল কেটে পঁচিশ ফুট চওড়া ও তিন ফুট গভীরতা একটি জলের ধারা তৈরি করেন। এই তিন ফুট জলের গভীরতা নদীটাই আংরাভাসা নদী নামে পরিচিত। এই নদী থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে চা-বাগানের ফ্যাক্টরির মেশিন চালানো হয়। কিন্তু ফ্যাক্টরির বাইরে চা-বাগানের অফিস, বাংলোতে হাজাক জ্বলত। হঠাৎ শোনা গেল এই নদী আর থাকবে না। কারণ সরকার আশি কিলোমিটার দূরে পাহাড়ি নদীতে বাঁধ দিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করেন। সেই বিদ্যুৎ চা-বাগানের ফ্যাক্টরি থেকে শুরু করে সমতলের বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে। ফলে সেই নদীর আর প্রয়োজন নেই। কিন্তু এই নদী চা-বাগানের ফ্যাক্টরির মেশিন চালানো জন্য তৈরি করা হলেও মানুষের দৈনন্দিনের বিভিন্ন কাজে লাগত। বৃদ্ধরা জন্মইস্কক এই নদী বয়ে যেতে দেখেছে। বছরে একবার যখন ফ্যাক্টরির মেশিন পরিষ্কার করার জন্য মূল নদীর বাঁধ বন্ধ করে দেয় -

“তখন উৎসবে মাতে সবাই। জলশূণ্য হতে আরম্ভ করলেই মাছেরা প্রাণের ভয়ে লাফালাফি করে। কাঁকড়া-চিংড়ির দল অসহায় হয়ে জলশূণ্য নুড়ি পাথরের উপর ছটফটিয়ে ঘোরে। আর মানুষেরা তাদের খপ খপ করে ধরে মহানন্দে। কয়েক ঘণ্টায় জলের প্রাণীরা মানুষের ঘরে চলে যায়।”<sup>৭</sup>

আবার মূল নদীর বাঁধ যখন খুলে দেওয়া হয় তখন জলে আর প্রাণ থাকে না। নদীতে কোন মাছ নেই চিলও আর জলের ঢেউয়ে আসে না। কিছু দিন পরে আবার মাছ জন্মায়। নদীর দুধারে শ্রমিকদের বাড়ি, তারা জন্ম থেকে নদীকে দেখে এসেছে। ফলে এই নদীর সঙ্গে তারা মিলেমিশে আছে।

“এই চায়ের বাগান, বাগানের ভেতরের ছায়াগাছ, সন্দের শুরু থেকে মাদল বাজিয়ে গান। যারা নেশা করে তাদের হাঁড়িয়া খাওয়ার যে জীবন তার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে যে নদী তাকে সরিয়ে নেওয়া হবে দৈনন্দিন জীবন থেকে।”<sup>৮</sup> আসলে নদী যে দৈনন্দিন জীবনে কত উপকারে লাগে যারা নদীর পাড়ে থাকে তারাই বোঝে। এই নদী বন্ধ হয়ে গেলে তারা মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি ধরতে পারবে না। কেউ কেউ আবার কষ্টের কথা ভুলে লাভের কথা ভাবে -

“জল যখন কল থেকেই পাওয়া যাবে তখন ওই হাঁটুজলের নদীর কোনও দরকার নেই। উল্টে লাভে কথটা একবার ভাবো। বহু বছর ধরে যে জমির ওপর জল বয়ে গিয়েছে নদী বন্ধ হয়ে গেলে সেই জমি যখন শুকিয়ে যাবে, তখন সেখানে চাষ করলে কি তরতাজা ফসল ফলানো যাবে? যে কলোনির পাশে যতখানি নদী ততটাই ভাগ পাবে তারা।”<sup>৯</sup>

সরকারি বিদ্যুৎ আসায় নদীটাকে মাঝ রাত্রে বন্ধ করে দেয়। ফলে নদী শুকিয়ে যায়। মাছ, কাঁকড়া, চিংড়ি আতঙ্কে লাফাতে থাকে। রাত জাগা পাখি, শেয়াল এই খাবার পেয়ে খুবই আনন্দ উপভোগ করে। ভোর হতেই কাক, চিল, শকুন নেমে আসে খাবার খেতে। বিদ্যুৎ আসায় শ্রমিক কলোনিতে জল পৌঁছে যায়। সদ্য শৌচাগার তৈরি করা হয়। কিন্তু মানুষ অভ্যাসের দাস ভোর হতেই শৌচ কাজের জন্য মগ হাতে নদীর গিয়ে দেখে নদীতে জল নেই। নদী শুকিয়ে যাওয়ার পর কলোনির মানুষরা হিসাব করে কী কী বীজ লাগানো যায়? কার কতটা জয়ায়গা বরাদ্দ? ঠিক তখনই খবর শুনতে পায় চা-বাগানের মালিকরা নদীতে শিশু চা-গাছ লাগাবে। এই শিশু চা-গাছ মানুষের কোন কাজে লাগে না। পাতা, ডাল, ফুল কোনটাই মানুষের উপকারী নয়। নদীতে চারাগাছ বড় হয়। বর্ষার পরে চারাদের সরিয়ে নেওয়া হবে। কিন্তু বর্ষায় প্রচণ্ড বৃষ্টির ফলে মূল নদী ফুলে ফেপে উঠে। শাখা নদী বন্ধ, পাহাড়ের জল আছড়ে পড়ে মূল খাতে। জলের ধর্ম নিজের পথ বেছে নেওয়া। তাই লকগেট ভেঙ্গে জলের ধারা শুকিয়ে যাওয়া নদীতে ঢুকে কচি চায়ের গাছগুলোকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। চা-সংস্কৃতি ও তার ইতিহাস কেন্দ্রিক গল্পগুলির ভেতর দিয়ে সমরেশ মজুমদারের স্মৃতি-রোমান্থনের বিষয়টি সদা জাগ্রত হয়। আসলে একজন শিল্পী তাঁর লেখনী চালান সময়ের মাপকাঠিতে। শৈশবে দেখা উত্তরবঙ্গের ঘন সবুজের মাতালরূপ পরিণত বয়সী লেখকের ভাবনায় অনেকটা আধুনিকতার মিশেলে নতুন চেহারায় উপস্থিত হয় - যা আসলে সমরেশ মজুমদার ও উত্তরবঙ্গের গভীর উপলব্ধি, নৈকট্যের পরিচায়ক।

## ২

উত্তরবঙ্গের নদীর প্রসঙ্গ উঠলেই তিস্তা নদীর কথা বলতে হয়। নদীকথা বা তিস্তা নদীর চরে বসবাসকারী মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা বহু সুপ্রতিষ্ঠিত লেখক তাঁদের গল্পে, উপন্যাসে উপস্থাপন করেছেন। যেমন দেবেশ রায় তিস্তা নদীকে কেন্দ্র করে লেখেন ‘তিস্তাপারের বৃত্তান্ত’, ‘তিস্তা পুরাণ’ নামে দুটি উপন্যাস। হারুন পাশার ‘তিস্তা’ উপন্যাস, অরুণ নিয়োগী তিস্তা নদীর বন্যার প্রেক্ষাপটে লিখেছেন ‘রান্ধসী তিস্তা’ নামে উপন্যাস। সমরেশ মজুমদারও বহু গল্পে তিস্তা নদী ও তার তীরবর্তী মানুষদের জীবন কথা ব্যক্ত করেছেন। লেখক জন্মের পরেই প্রথম আংরাভাসা নদী দেখেন। এই নদীকে নিয়ে লিখেছেন ‘আংরাভাসা’ নামে একটি গল্প। লেখক ছয় বছর বয়সে প্রথম তিস্তা নদী দেখেন। জলপাইগুড়ি জেলা স্কুলে পড়ার সময় বন্ধুদের সঙ্গে তিস্তা নদীর চরে কত আড্ডা মেরেছেন। এই নদীর উপর নির্ভর করে কত মানুষ জীবন জীবিকা নির্বাহ করে। ফলে এই নদী তাদের কাছে মাতৃ সুলভ। আবার কখনও কখনও এই নদী ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। বন্যার সময় কত মানুষ, পশু, কাঠ ভেসে যায়। তিস্তার চরের কিছু মানুষ সেই ভেসে যাওয়া কাঠ সংগ্রহ করতে নদীতে নেমে পরে। লেখক তিস্তার চরে বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরতে গিয়ে মেয়েলি কণ্ঠ শুনতে পান -

“তখন আবিষ্কার করলাম আদিবাসী মেয়েরা তিস্তায় ভেসে যাওয়া কাঠ ধরতে জলে নেমেছে।”<sup>১০</sup>

অর্থাৎ তিস্তা নদীকে ঘিরে উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবন, তাদের বেঁচে থাকা ও সংগ্রামের পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল 'জননী'। এই গল্পে লেখক বুড়ি তিস্তা নদীকে জননীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের কাছে তিস্তা শুধু নদী নয়, দেবীর স্বরূপ। তাই এই নদীকে তিস্তাবুড়ি নামে পূজা করে। তিস্তাবুড়ির পূজা গ্রীষ্মকালে করা হয়। বন্যায় তিস্তা পারের বাসিন্দাদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। আর গ্রীষ্মকালে জলের হাহাকার দেখা দেয়। যার ফলে ফসলের ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই সব কিছুর থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তিস্তাবুড়ির পূজা করা হয়। রাজবংশীদের মতে এই পূজা শুধু নদীকে তুষ্ট করা নয়, পরিবারে সুখ শান্তি বজায় রাখা। অবিরাম বৃষ্টির ফলে বুড়ি তিস্তা নদী যখন ফুলে ফেপে উঠে তখন কাঠের গুঁড়ি ধরার জন্য খেনপাড়ার রাজবংশী মেয়েরা নদীর দিকে চেয়ে থাকে। এই 'খেন' শব্দটি নিয়ে নানা ইতিহাস আছে কেউ কেউ মনে করেন, প্রাক-অহম গোষ্ঠীর একটি শাখা হল খেন বংশ। খেন সম্প্রদায়ের মানুষরাই উত্তরবঙ্গের আদি বাসিন্দা। কোচবিহারের প্রথম রাজা বিশ্বসিংহের পূর্বে খেনবংশীরা রাজত্ব করতেন। এই খেন রাজবংশীরা নিজেদের কামতাপুরের শাসক নীলধ্বজ, সিংহধ্বজ ও নীলাম্বরের বংশধর বলে দাবি করতেন। কোচবিহারে বহু স্থাননামে 'খেন' শব্দটি তাঁর পরিচায়ক। তিনদিন বৃষ্টির ফলে বুড়ি তিস্তা পারের কেউ ঘর থেকে বের হয়নি। তিস্তার চরের মানুষের কাছে এই নদী আত্মীয়ের স্বরূপ হয়ে ওঠে। তাই তিস্তা হয়ে ওঠে বুড়ি তিস্তা। বৃষ্টি একটু কমলে গল্পের নায়িকা বিন্দু বাঁধের কাছে এসে হতবাক –

“হা মা বুড়ি তিস্তা, তোমার এ কি চেহারা গো। মাটি খেয়ে খেয়ে জলের রং এত কালো হয়। আই বাপ বৃকে ভয় লাগে আর কী মোটা হয়ে গেল নদীটা। নদীটাকে বুড়ি কে বলবে তখন। স্রোতের কী ছোবল তার? ভর বয়সের বিয়ের জল-খোঁজা ছুড়িব মতো চনমনে।”<sup>১১</sup>

আর এই স্রোতের টানে হাবুডুবু খেয়ে যাচ্ছে কালোমানিকের ঝাঁক অর্থাৎ কাঠের গুঁড়ি। বিন্দু লক্ষ করে কিন্তু কাঠের গুঁড়িগুলো নদীর মধ্যদিয়ে ভেসে যায়। বিন্দু এক কোমর জলে নেমে ছোট ছোট কাঠ আর বাকল জড়ো করে। এই করতে বিন্দু হাপিয়ে গিয়ে বালির উপর চিং হয়ে শুয়ে পড়ে। ঠিক তখনই বিন্দুর নজরে পড়ে হাত দশেক একটি কাঠের গুঁড়ি এদিকে আসছে। বিন্দু বুড়ি তিস্তাকে মানত করে –

“পাঁচ পয়সার বাতাসা মা, ও মাগো বুড়ি, মানত রইল, ঠেলে দাও এদিকে, ঠেলে দাও।”<sup>১২</sup>

গুঁড়িটা অল্প জলে আসতেই বিন্দু ঝাঁপ দিল। গুঁড়িটাকে টেনে আনতে গিয়ে স্রোতের টানে সমান্তরাল ভাবে কিছুটা ভেসে চলে। শেষে দু'হাতে ডাল পালা ধরে চরে আনে। বিরাট গাছ কমছে কম কুড়ি টাকার কিন্তু অর্ধেকটাই জলে রয়েছে। কি একটা খস খস শব্দ হতেই বিন্দু শিউরে উঠে। একটি কালো গোখরো সাপ গাছের গুঁড়ি থেকে বালিতে নামছে। সাপটির সঙ্গী আছে কি না তা পরীক্ষা করতে বালি ছিটায়। কিন্তু কোনো সাড়স শব্দ নেই। গাছের গুঁড়িটাকে একা নড়ানো সম্ভব নয় তাই বিন্দু তার স্বামীকে ডাকবে কিনা ভাবে। গাছের গুঁড়িটাকে টানাটানি করতে নজড়ে পড়ল দুটো শরীর একে অপরে জড়াজড়ি করে মিশে রয়েছে। বিন্দু মড়া দুটোকে কাশ ফুলের জঙ্গলে টেনে আনে। বিন্দু স্থির করল যেহেতু নদীর ধারে কেউ নেই তাই চেচাবে না। পাড়ার মাথা সুরেনকেও বলবে না। কারণ তার গাছের গুঁড়িটা হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাই বাড়িতে এসে স্বামীকে বলে –

“হেই উঠ উঠ উঠ না কেনে, আঃ মরণ আমার। একবার নদীর ধারে চল কেন, বিরাট গাছ ধরেছি। এক কুড়ি টাকার গাছ। আর জোড়া বরবউ! মড়া।”<sup>১৩</sup>

বিন্দু একটা দা নিয়ে স্বামীর সঙ্গে নদীর দিকে দৌড়ে আসে। কিন্তু নদীর কাছে এসে তার মাথা ঘুরে যায়। গাছটা নেই। জলের স্রোতে ভেসে গেছে। বিন্দুর স্বামী মড়া দুটোর চারদিকে ঘুরে পুরুষটার জামা কাপড় খুলে নেয়। তার পর বউটার পড়নে নতুন শাড়ি দেখে লোভ সামলাতে পারে না। তিস্তা-বন্যা-উত্তরবঙ্গের দরিদ্র মানুষের লড়াইয়ে এক আলাদা জীবন। বিন্দু ও তার স্বামী তার পরিচায়ক। একদিকে বন্যা কবলিত তিস্তার চর এলাকার অসহায় জনজীবন অন্যদিকে বেঁচে থাকার মানুষের কী পরিমাণ দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা। যে বন্যা মৃত মানুষ দুটির পরণের কাপড় দুটি খুলে নিতে চায় বিন্দুর স্বামী। আর এই সবটাই ঘটে তিস্তা নদীবক্ষে। উত্তরবঙ্গের তিস্তা নদী এলাকার এ-এক বাস্তব দৃশ্য। নিম্নবিত্ত জীবনের করুণ পরিণতি। যা লেখক তাঁর গল্পের বিষয়ে এনেছেন। তিস্তা এভাবেই একদিকে বিন্দুদের জীবন রক্ষা করে।

অন্যদিকে বন্যায় বুড়ি তিস্তা ভয়ংকর রূপ ধারণ করে। বাঁধ ভেঙে তিস্তার জল কত বাড়ি, মানুষ, পশু ও গাছপালা ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল ‘অন্নপ্রাশন’। এই গল্পে লেখক দেখিয়েছেন তিস্তা নদীর বন্যার ভয়াবহ রূপকে। তিস্তার বাঁধের পাশে উমাপদ ও তার স্ত্রী শিবানী ছাদের বাড়িতে থাকে। উমাপদ বাড়ির উঠোন সিমেন্ট দিয়ে তৈরি করা। দুটো বারো হাত লম্বা গম্বুজ বানিয়েছে। একটিতে ধান আর একটিতে চাল রাখে। বৃষ্টির জল ঢুকতে পারে না। আট বিঘা জমিতে ধান চাষ করে। এই ধানের চাল উমাপদ গয়েরকাটা, ধূপগুড়ির হাটে বিক্রি করে। আর এ সব পাহারা দেয় লম্বায় সাড়ে চার ফুট দুটো কুকুর। আট বিঘা জমির ধান আর কয়েকদিন গেলে কাটবে। তার বাড়িতে তিন-চারটে লোক চাল ঝাড়াইয়ের কাজ করে। লেখক উমাপদের মধ্য দিয়ে উত্তরবঙ্গের কৃষিজীবী মানুষের চিত্র অঙ্কন করেছেন। উমাপদ রাতে খাওয়া দাওয়া শেষ করেই গুমগুম শব্দ শুনতে পায়। তার মনে পড়ে বুড়ি তিস্তার বুকো এই শব্দ শুনতে পেলেই বন্যা হয়। কিন্তু মঙ্গলঘাট থেকে জলপাইগুড়ির মুখ পর্যন্ত শক্ত বাঁধ দিয়েছে সরকার। এই বাঁধ ভাঙার সাধ্য নদীর নেই। উমাপদ ভাবে -

“শালার জোত ভরতি ধান - রাতভোর এই হাওয়া চললে যে বেগুনটুলির গলির মেয়েছেলেদের মতো হাটু ভেঙে পড়ে থাকতে হবে।”<sup>৪৪</sup>

নদী উত্তরবঙ্গের মানুষের কাছে কখনও আশীর্বাদ আবার কখনও অভিশাপ হয়ে উঠে। উমাপদ যখন শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখছিল শিবানীর হাতের ঠেলায় উঠে দেখে ঘরে জল ঢুকছে। সাপের মতো খল খল, ছলাং ছলাং শব্দ করে। ঘরে প্রায় এক হাটু জল। উমাপদ কোন রকমে আলমারি থেকে লোহার হাত বাক্সটা বের করে শিবানীকে নিয়ে ছাদের দিকে যায়। উমাপদ ছাদের চিলে কোঠায় এসে দেখে দরজা তালামারা। কয়েকবার ধাক্কা দিয়ে দরজা ভাঙে। ছাদে এসে দেখে তিস্তার জলে গম্বুজ দুটো ডুবু ডুবু হয়ে আছে। ছাদ থেকে তিন হাত দূরে জল। লেখক দেখিয়েছেন তিস্তার বন্যায় উমাপদ ও স্ত্রী শিবানী বাড়ির ছাদে আশ্রয় নিয়ে বাঁচে। কিন্তু এই তল্লাটের বাকি মানুষ, পশু, গাছপালার অবস্থা ভয়ংকর।

“গেরুয়া রঙের জলের স্রোত গাছপালা গরুবাছুর ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওর বাড়িটাকে মধ্যখানে রেখে। এরই নাম কি প্রলয়?”<sup>৪৫</sup>

পরের দিন সকালে সূর্য উঠতেই চারধারে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যায় -

“দূরের বাড়ি-ঘরগুলো ভাঙা-ভাঙা, কোথেকে গাছপালা বয়ে এসেছে জল স্রোত এখানে-ওখানে আটকে আছে। তিস্তাকে দেখা যাচ্ছে বাঁধের ওপাশে, বাঁধটা শিখণ্ডীর মতো দাঁড়িয়ে, অথচ এপাশেও তিস্তা।”<sup>৪৬</sup>

জল একটু নামতেই উমাপদ দেখতে পায় একটা পেটফোলা গরু ভাসাভাসি করছে। গম্বুজের সিঁড়ির ফাঁকে দুটো দেহ লটকে আছে একটি মানুষের অন্যটি কুকুরের। উত্তরবঙ্গের তরাই-সমতল অঞ্চলের মানুষের বিপদ-সংকুল জীবনালেখ্য অত্যন্ত বাস্তব মরমী হয়ে ফুটে উঠেছে সমরেশ মজুমদারের গল্পে।

### ৩

উত্তরবঙ্গ প্রাকৃতিক বনাঞ্চলে সমৃদ্ধ। এখানে বৈচিত্র্যময় বনভূমি থাকায় বিভিন্ন ধরনের বন্য প্রাণীর আবাসস্থল হয়ে উঠে। বন্য প্রাণীদের মধ্যে হাতি, গণ্ডার, বাঘ, চিতাবাঘ, বাইসন, বানর, ময়ূর এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের পাখি ও সরীসৃপ প্রাণী রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বেশির ভাগ বনভূমি উত্তরবঙ্গে রয়েছে। যেমন গরুমারা, চাপড়ামারি, খুঁটিমারী, লাটাবাড়ি, বস্কা, চিলাপাতা, জলদাপাড়া ইত্যাদি ফরেস্টে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভ্রমণ পিপাসু মানুষরা ঘুরতে আসে। সমরেশ মজুমদার উত্তরবঙ্গের ফরেস্টকে কেন্দ্র করে বহু গল্প লিখেছেন। এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল ‘নিজের মুখ’। এই গল্পে লেখক উত্তরবঙ্গের চাপড়ামারি বনাঞ্চলের চিত্র অঙ্কন করেছেন। কলকাতা থেকে অরুণ, পরিতোষ ও হরিদাস উত্তরবঙ্গের চাপড়ামারি ফরেস্টে ঘুরতে আসে। প্রথমেই লেখক ফরেস্টের বাংলোর চিত্র দেখিয়েছেন। চারপাশে জঙ্গলের মাঝে চাপড়ামারি ফরেস্ট বাংলো। বাংলোটি কাঠের, দেখতে ছবির মতো। চারদিকে দশ ফুট খাদ দিয়ে ঘেরা। কাঠের সাঁকো দিয়ে বাংলোয় যাতায়াত করে। বাংলোর নীচে মাটি কেটে হাতিদের জন্য একটা পুকুর তৈরি করা আছে। বাংলো এবং তার চারদিকটা এত সুন্দর যে কেউ এলেই প্রেমে পড়ে যায়। অরুণ এর আগে দু’তিনবার এই ফরেস্টে গাছ দেখতে এসেছিল।

তাই বিট অফিসার তার চেনা। এই রেঞ্জেরই বিট অফিসারকে একশো টাকা দিয়ে গাছ কেটে ছিল। বিট অফিসার অরুণদের গাড়টাকে ভিতরে আনতে বলে। অরুণ কারণ জানতে চাইলে বিট অফিসার বলে -

“আর বলবেন না প্রচুর হাতি এসে গেছে এসব জঙ্গলে। কীভাবে যে বেঁচে আছি বুঝবেন না স্যার।”<sup>১৭</sup> হাতির থেকে নিস্তার পেতে কাঠের সাঁকোটি খুলে ফেলা হয়। পরিতোষ এর আগে এই ফরেস্টে আসেনি। তাই এই ফরেস্টে কী কী জন্তু আছে জানতে চায়। বিট অফিসার বলে -

“সব আছে। তবে কেউ কেউ বেরোয়, কেউ কেউ বেরোয় না। ওই সামনের পুকুরটা দেখছেন, সন্ধে হলেই দেখবেন পাল পাল হাতি এসে স্নান করছে ওটাতে। হাতির জন্য করা হয়েছে ওটা।”<sup>১৮</sup>

অরুণদের খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা বাংলায় হয়। বিট অফিসার আজকে দুটো বন মুরগি মেরেছে। ফলে রাতের খাবার মুরগি দিয়ে রুটি। ইতি মধ্যে বাংলাতে আরও দু’জন ট্যুরিস্ট এসে উপস্থিত হয়। রাতে খাওয়ার পর অরুণরা বিট অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলে ঘুরতে যায়। অরুণ মাল খেয়ে বেসামাল অবস্থায় গাড়ি চালায়। কিছুদূর যাওয়ার পর তারা জঙ্গলে ভীষণ শব্দ শুনতে পায়। আসলে হাতিরা গাছের ডাল ভেঙে এই শব্দ করে। বিট অফিসার অরুণকে গাড়ির লাইট নেভাতে বলে। কারণ সত্তর গজ দূরে হাতির পালটা দেখতে পাওয়া যায়। বিট অফিসার গাড়ি থেকে নীচে নেমে বলে -

“আপনারা নেমে আসুন। আমি সটকার্ট রাস্তা চিনি। হাতি এখানে আসার আগেই আমরা বাংলায় পৌঁছে যাব। কুইক।”<sup>১৯</sup>

অরুণ গাড়ি থেকে নামল না। হেড লাইট নিভিয়ে স্টিয়ারিংয়ে মাথা রেখে চোখ বন্ধ করে রইল। হাতির দল ছাগলের পালের মতো গাড়টাকে মাঝখানে রেখে চলে যায়। ফরেস্টের গাছ থেকে প্রাণীদের রক্ষণাবেক্ষণ করার দায়িত্ব বিট অফিসারদের। অথচ বিট অফিসারদের চোখে ধুলো দিয়ে চোরা শিকারিরা গণ্ডারের খড়গ ও হাতির দাঁত সংগ্রহ করতে কত প্রাণীকে মারছে। এই কারণে হাতিরা মানুষের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল ‘বিক্রম’। এই গল্পে স্বপ্নেন্দু উত্তরবঙ্গের একটি ফরেস্টের বিট অফিসার। তার উপর জঙ্গলের সমস্ত জানোয়ারের দায়িত্ব রয়েছে। একটি জানোয়ার মরলে তাকে হাজার কৈফিয়ত দিতে হবে। রাতে জঙ্গলে একটা গুলির শব্দ শোনা মাত্রই স্বপ্নেন্দু হাতির পিঠে চড়ে সমস্ত ক্যাম্পে জানিয়ে দেয়। কিন্তু কোন চোরা শিকারি ধরা পড়েনি। লাটাগুড়ির রেঞ্জার অফিসাকে রিপোর্ট পাঠিয়ে দেয়। স্বপ্নেন্দু সারা রাত জঙ্গলে ঘুরে দেখে। এই গুলিতে কোথাও কোন জানোয়ার মরে আছে কিনা।

“সারা জঙ্গল ঘুরে দু’বার বাইসনদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। যে কটা গণ্ডার এই জঙ্গলে আছে তারা ধারে কাছে ছিল না বন শূয়ার আর ময়ূর ছাড়া কিছুই চোখে পড়েনি।”<sup>২০</sup>

কিন্তু বুনো হাতির সামনে পড়লে প্রাণ উড়ে যেত। এমনকি বুনো হাতিরা স্বপ্নেন্দুর পোশ মানা হাতি হিমালয়কেও ছেড়ে দিত না। ভোর হতেই স্বপ্নেন্দু বাংলায় ফিরে এসে একটা অ্যাম্বাসাডার দেখতে পায়। দু’জন মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। একজনের বয়স ত্রিশের ঘরে অন্য জনের সতেরো বছরের। জিঙ্গ পরা মেয়েটি হিমালয়ের কাছে আসতেই স্বপ্নেন্দু চিৎকার করে উঠে। কারণ তাদের পোশ মানা হাতিটি মেয়েদের পছন্দ করে না। স্বপ্নেন্দু বলে -

“হাতিটা মেয়েদের একদম পছন্দ করে না। এর আগে দুটি মেয়েকে ও মেরে ফেলেছে। ঘটনাটা আবার ঘটুক আমরা চাইনি।”<sup>২১</sup>

আসলে মেয়েটা বাংলায় থাকার জন্য স্বপ্নেন্দুর সঙ্গে কথা বলতে আসে। এই ফরেস্টের বাংলায় দুটি ঘর। একটি ট্যুরিস্টদের জন্য অন্যটি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বড় কর্তার ঘর। ট্যুরিস্টদের বাংলায় থাকতে হলে রেঞ্জার অফিসে বুকিং করে আসতে হয়। এই ট্যুরিস্টরা বাংলা বুকিং করে আসেনি। ফলে তাদের ঘর পেতে আইনত কোন নিয়ম নেই। কারণ কোন ট্যুরিস্ট যদি টিকিট বুক করে আসে তাহলে তাদের ঘর ছেড়ে দিতে হবে। কিন্তু কোন ট্যুরিস্ট এলে স্বপ্নেন্দু আগেই জানতে পারে। ফলে কোন ট্যুরিস্ট আসার সম্ভাবনা নেই বলে তাদের বাংলায় থাকতে দেওয়া হয়। খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা নেই। নিজেদের রান্না করে খেতে হবে। যার কারণে ট্যুরিস্টরা ফ্যাসাদে পড়ে যায়। সকাল বেলায় স্বপ্নেন্দু আবার বোমার আওয়াজ শুনতে পায়। এই বোম হাতি তাড়ানোর জন্য ফাটানো হয়। তাই তিনি হিমালয়ের পিঠে চড়ে ক্যাম্পের দিকে

যায়। ক্যাম্পের সামনে যেতেই নজরে পড়ল হাতি বের হয়েছে। ক্যাম্পটাকে মাটিতে গুড়িয়ে দিয়েছে। চারজন কর্মী ডিউটিতে ছিল। তারা কোন রকমে প্রাণে বেঁচে পালিয়ে যায়। তন্য তন্য করে দেখে স্বপ্নে জ্ঞানতে পারে –

“অন্য সময় হাতির পাল এলে বোম ফাটালেই সরে যায়। আজকে মরীয়া হয়ে এসেছিল, যেন প্রতিশোধ নেবার ব্যাপার। বোমটোম কেয়ার করেনি। যতক্ষণ না ক্যাম গুঁড়িয়ে যাচ্ছে ততক্ষণ শান্ত হয়নি।”<sup>২২</sup>

আসলে হাতিদের এই প্রতিবাদের কারণ হল দু’জন মহিলা ট্যুরিস্টের গার্জিয়ান হিসাবে যিনি এসেছেন কাল রাতে তার বউয়ের আবদার মেটাতে গিয়ে দল ছুট হওয়া এক শিশু হাতিকে গুলি করে। যদিও গুলিটি লাগেনি। তাই হাতির দল বাংলায় এসে বিক্ষুব্ধ দেখায়। বাংলার চারদিকে দশ ফুট খাল থাকায় ঢুকতে পারেনি। না হলে বাংলাটিও গুঁড়িয়ে দিত। এই গল্পে হাতি একটি চরিত্র। কল্পনা ও বাস্তবের এক চমৎকার মিশেল। পশু ও মানবের সহাবস্থান উল্লখীয় এই গল্প।

‘অক্টোপাস’ গল্পে অভিরাম তিনযুগ ধরে জঙ্গলে বাস করে। এখনও জঙ্গলের মন বুঝতে পারেনি। মেয়েদের মতো জঙ্গলেরও মন বোঝা কঠিন। অভিরাম জঙ্গলে হাতি ধরে। ছোট কিশোর হাতি। সরকারের কাছে হাতি ধরার ইজারা নেয়। প্রতি বছর কিশোর হাতি ধরে দিতে হবে। তার বিনিময়ে সরকার টাকা দেয়। হাতিকে কোন আঘাত না করে জ্যান্ত ধরতে হবে। অনেক চোরা শিকারি আসে হাতিদের মেরে দাঁত চুরি করে। অভিরামকে হাতি ধরার কাজে সাহায্য করে দুটো পোশা হাতি। একটির নাম হীরামন অন্যটির নাম হীরামতি। আর দুটো লোক। একজনের বয়স পঁচিশ অন্য জনের বয়স ত্রিশের বেশি। অভিরাম লোক দুটোকে টাকার বিনিময়ে ভুটানের একটা পাহাড়ি গ্রাম থেকে এনেছেন। এই মানুষগুলোর জন্মই যেন হাতির সঙ্গে পাল্লা দেওয়া। তাদের সম্পর্কে অভিরামের ভাবনা –

“খাবার ওদের কাছে স্বর্গের চেয়ে বেশি লোভনীয়। সেই খাবারের লোভ দেখিয়ে ওদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় সে।”<sup>২৩</sup>

হাতি ধরার আগে লোক দুটো শরীরে কাদা মেখে রাখে। দিন রাত হাতির সঙ্গে থাকে। এছাড়া কিছু নিয়ম পালন করে –

“এই ক’দিন ওদের মাছ ডিম পেঁয়াজ রসুন খাওয়া নিষেধ। এই ক’দিন মদ, বিড়ি, খইনি খাওয়া কিংবা স্ত্রীসঙ্গ করা বেআইনি। অত্যন্ত পবিত্র হয়ে হাতির শরীরের গন্ধ নিজেদের শরীরে মাখতে হবে ওদের। দিনরাত হাতির সঙ্গে থেকে-থেকে মানুষের চামড়ায় হাতির গন্ধ লেগে যাবে।”<sup>২৪</sup>

তাই যতদিন হাতি ধরা না পরে ততদিন তারা নুন আর আলু সেদ্ধ ভাত খায়। জঙ্গলের পাশে লেপচাদের ছোট একটা গ্রাম আছে। উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার একটি জনগোষ্ঠী লেপচা। সেখানে একটা ছোট মুদির দোকান আছে। সেই দোকানির একটি যুবতী মেয়ে সহ দুটি কিশোরী মেয়ে অভিরামের তাবুতে সওদা নিয়ে আসে। অভিরামের বয়স হয়েছে। কিন্তু যুবতী মেয়েটিকে দেখে যৌবনের জোয়ার ভেসে ওঠে। তাই অভিরাম দেখতে বুড়ো হলেও মেয়েটিকে পেলে আর বুড়ো থাকবে না।

“ও মেয়ে সঙ্গে থাকলে যৌবন ফিরে আসতে বাধ্য। আজ যখন তাবুর ভেতর ঢুকেছিল তখনই নাকে বাস এনেছিল। না কোনও দোকানির গন্ধ নয়, শ্রেফ যৌবনের বাস।”<sup>২৫</sup>

অভিরাম এবারেই শেষ হাতি ধরে জঙ্গল ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে। ভুটানের এই মানুষ দু’জন হাতি ধরতে ওস্তাদ। একজনের নাম মইনু তার বয়স হয়েছে। অন্য জন পঁচিশ বছরের যুবক সে প্রথম হাতি ধরবে। অভিরামের নির্দেশ মত মইনু প্রথমে একটি গর্ত খুঁড়ে ঢেকে রাখে। এর পর তারা পোশা হাতি দুটির ঘারে কাপড়বিহীন হয়ে এমন ভাবে মিশে থাকে যাতে বুনো হাতির টের না পায়। এই ভাবে হীরামন আর হীরামতি বুনো হাতিদের দলে মিশে, কিশোর হাতিকে আলাদা করে গোপন গর্তে নিয়ে আসে। এরপর লোক দুটো চিৎকার করে –

“অনেক অনেক ট্রেনিং নিতে হয় ওই চিৎকার নিখুঁত করার জন্য। শব্দটা অবিকল কোনও হাতি বিপদে পড়লে করে থাকে। সেটা কানে যাওয়া মাত্র কিশোর ভাবে সেও বিপদে পড়েছে। তৎক্ষণাৎ সে গুঁড় তুলে চিৎকার করতে চাইবে। যেই গুঁড় ওপরে উঠবে অমনি দুটো দড়ির ফাঁস তাতে গলায় দেবে মানুষ দুটো। ভয় পেয়ে গুঁড় নামিয়ে নেওয়া মাত্র কিশোরের গলায় ফাঁস এটে বসবে। তৎক্ষণাৎ ছুটতে শুরু করবে হীরামন আর হীরামতি।”<sup>২৬</sup>

এই ভাবে কিশোর হাতিটিকে মাঝখানে রেখে দৌড়াতে থাকে। শেষ পর্যন্ত কিশোর হাতিটি গোপন গর্তে পড়ে যায়। কিন্তু এবারে মইনু আর পাঁচশ বছরের যুবকটি সব নিয়ম পালন করে। তবে পাঁচশ বছরের যুবকটি গভীর রাতে দোকানির যুবতী মেয়েটির সঙ্গে মিলিত হয়ে হাতি ধরতে যায়। ফলে বুনো হাতির দলনেত্রী যৌবনের গন্ধ টের পেয়ে হীরামনের পিছনে ধাওয়া করে পাঁচশ বছরের যুবককে মাটিতে পিসে মেরে ফেলে। সমরেশ মজুমদারের চমৎকার গল্প এটি। বরাবরই সমরেশ মজুমদার নিম্নবিত্ত-নিম্নবর্ণের অসহায় মানুষের সহায়কে কথা বলেছেন বহু গল্পে। তাদের বেঁচে থাকার জীবনকে নিরীক্ষণ করেছেন। নিম্নবর্ণ-নিম্নবিত্তের প্রতি সমাজের একশ্রেণির লোভী নর পিসাচ কীভাবে তাদের ভর করেই নিজেরটা গুছিয়ে নেয় তাঁর গল্পগুলি না পড়লে বোঝা যায় না।

## 8

উত্তরবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ নিম্নবিত্তের অধিকারী। তাদের পেশা কৃষিকাজ। এছাড়াও নদী ও জঙ্গলের উপর নির্ভর করে জীবন যাপন করে থাকে। উত্তরবঙ্গে রাজবংশীসহ বিভিন্ন নিম্নবিত্তের জনজাতির মানুষ বসবাস করে। সমরেশ মজুমদার তাঁর বহু গল্পে উত্তরবঙ্গের নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন সংগ্রামের কথা ব্যক্ত করেছেন। নিপীড়িত বঞ্চিত মানুষের বাস্তব চিত্র তুলে ধরেছেন। একসময় এই অঞ্চলের প্রান্তিক কৃষকরা জমিদার-জোতদারদের দ্বারা বহুদিন ধরে শোষিত হয়েছে। নিম্নবিত্তের কৃষকদের কাছ থেকে জোরজুলুম করে জমির তিনভাগ ফসলের দু'ভাগ তুলে নিত। উত্তরবঙ্গে জমিদার-জোতদারদের দ্বারা শোষিত নিপীড়িত বঞ্চিত কৃষকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। ১৯৬৭ খ্রিস্টাব্দে জমিদারদের বিরুদ্ধে শুরু হয় আন্দোলন। যা নকশাল আন্দোলন নামে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে সমরেশ মজুমদারের উল্লেখযোগ্য একটি গল্প হল 'যুদ্ধক্ষেত্রে একজন'। এই গল্পে ময়নাগুড়ির প্রান্তিক কৃষক শিবু জমিদারের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়। "লাঙল যার জমি তার।"<sup>২৭</sup> জমিদার শুধু বীজ ধান আর সার দিয়ে কৃষকদের তিনভাগের দু'ভাগ ফসল ঘরে তুলে নেয়। এদিকে কৃষকরা জমিতে ফসল ফলালেও সারা বছর খেতে পায় না। শেষে জমিদারের কাছে হাত পাততে হয়। বউ ছেলেমেয়েদের জন্য ভালো পোশাক কিনতে সাহস পায় না। তাই শিবু জমিদারের বিরুদ্ধে গর্জে উঠে -

"দুনিয়ার খেতে না পাওয়া মানুষ এক হোক।"<sup>২৮</sup>

জমিদার হরিশ রায় শিবুকে দমাতে ষড়যন্ত্র করে। শাল গাছ চুরি করার মিথ্যা অপবাদে শিবুকে জেলে ঢুকিয়ে দেয়। লেখক শুধু কৃষকদের কথাই নয়, তিস্তা নদীর চরে বসবাসকারী নিম্নবিত্ত মানুষের কথাও ব্যক্ত করেছেন। জলপাইগুড়ির তিস্তা নদীর উপর নির্ভরশীল বহু নিম্নবিত্ত মানুষের জীবন যন্ত্রণার পরিচয় পাওয়া যায়। তিস্তার চরে খেন রাজবংশী সম্প্রদায়ের মানুষরা বসবাস করে। বন্যায় তাদের ঘর বাড়ি যেমন নিমিষেই ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তেমনি তিস্তায় ভেসে আসা কাঠ সংগ্রহ করতে খেন রাজবংশী পাড়ার মেয়ে পুরুষরা নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। আবার কখনও কখনও মৃত মানুষের মড়াও ভেসে আসে। সেই মৃত মানুষের জামা কাপড়ও খুলে নেয়। মানুষ কতটা দরিদ্র হলে মৃত মানুষের কাপড় খুলে নিতে বাধ্য হয়? লেখক 'জননী' গল্পে তিস্তা নদীর চরের নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনের কথা তুলে ধরেছেন। এই গল্পে বিন্দু তিস্তার বন্যায় ভেসে আসা একটা গাছের গুঁড়ি টেনে আনে। কিন্তু গাছের গুঁড়ির সঙ্গে দু'টি লাশ ছিল। একটি পুরুষ এবং অন্যটি মহিলা। অর্থাৎ বর ও বউকে বিন্দু কাশ বনের জঙ্গলে টেনে আনে। বিন্দু বাড়িতে গিয়ে স্বামীকে ডেকে নিয়ে আসে। নদীর চরে এসে দেখে কুড়ি টাকার গাছের গুঁড়িটাকে নদী ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। বিন্দুর স্বামী তিস্তার বন্যায় ভেসে আসা মৃত বর ও বউয়ের শরীর থেকে জামা কাপড় খুলে নিয়ে বলে -

"নে ধর, নতুন শাড়ি। হাই বাপ, মা কালীর মতো দেখায় যে তোরে। নে-নে পরে নে ক্যান।"<sup>২৯</sup>

বিন্দু নতুন শাড়ি পেয়ে গাছের গুঁড়িটার দুঃখ ভুলে যায়।

উত্তরবঙ্গের তিস্তা নদীর পাশেই রয়েছে জলপাইগুড়ি শহর। জলপাইগুড়ি শহরের দিনমজুর, ঠেলাওয়ালা, রিক্সাওয়ালা, ঠিকে ঝি-দের নিম্নবিত্ত জীবন নিয়ে সমরেশ মজুমদারের একটি গল্প হল 'চর, শহর এবং একটি বেকুফ'। এই গল্পে শহরে এক ভিনদেশী দিনমজুর সারাদিন কাজ করে রাতে শহরের ফুটপাতে বুপড়িতে থাকে। শহরের নগরপালের করা নির্দেশ -

“শুধু দিনমজুরি করে যাও, তা বেশ, কিন্তু রাত্তির বেলায় ফুটপাতে থাকা যাবে না।”<sup>১০</sup>

ভিনদেশী লোকটির বুপাড়ি ভেঙে দিয়ে নগরপাল তাকে জেলখানায় নিয়ে যায়। তিনদিন মার খেয়ে ছাড়া পায়। তাকে ভাড়া বাড়িতে থাকার নির্দেশ দেয়। কিন্তু একজন দিনমজুরির পক্ষে ভাড়া ঘরে থাকা সম্ভব নয়। তাছাড়া তাকে কে ঘর ভাড়া দেবে? ফলে এই ভিনদেশী লোকটির শহরে ঠাই মেলেনি। শেষে বাধ্য হয়ে নদীর চরে বাঁশের দরমা দিয়ে চালা বানিয়ে মাথা গোজার জায়গা করে নেয়। যেহেতু নদীর চর শহরের সম্পত্তি নয় সুতরাং শহরের কোন মাথা ব্যাথা নেই। এই খবর শহরের নিচুতলার রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা কানে পৌঁছে যায়। নদীর চরে আরও দুজন ঘর করে। এরা দুজন স্বামী ও স্ত্রী। বউটি শহরের বাড়িতে বাড়িতে বাসন মাজে। আর তার স্বামী গাজার ব্যবসা করে। এভাবে নদীর চরে রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা মিলে মোট পনের ঘর বাসিন্দা হয়ে যায়। নদীর চরে লোক বাড়ায় থানার দারোগাবাবু জানায় -

“এই চরে লোক বাড়ার পর থেকে শহরে চুরিচামারি বেড়ে গেছে। লোকে বলছে চরের লোকই রাতে শহরে চুরি করতে যায়। এটা বেআইনি বসতি অতএব উঠে যাও তোমরা।”<sup>১১</sup>

আসলে নিম্নবিত্ত মানুষদের নির্জন নদীর চরেও শান্তিতে থাকার অধিকার নেই। প্রতি মুহূর্তে নদীর চরে বসবাসকারী মানুষদের মনে ভয় জাগে নদী ফুলে উঠলে চালা ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। এরই মধ্যে নদীর চরে আসা প্রথম দিনমজুর লোকটির মনে প্রেম জেগে ওঠে। লোকটি মেয়ে মানুষের ছায়া মারাত না। ঠিকে ঝি বউটির বোন লোকটির মনে প্রেম জাগিয়ে তোলে। তারা দুজনে সংসার শুরু করে। তিন মাস হতে না হতে মেয়েটি সন্তান সম্ভবা হয়। এই খবর শুনে লোকটি হাসে। মেয়েটি বলে -

“হেসো না। এখন তোয়াজ করবে কি দিয়ে? কটা টাকা কামাও? আমার এখন ঝাল মাংস খেতে ইচ্ছে করছে, খাওয়াও দিকি।”<sup>১২</sup>

লোকটি দিনমজুরি করে যা পায় তাতে ভাত সেদ্ধ জোটাতে পারে। কিন্তু দিনমজুরি করে কিভাবে বউয়ের খাওয়ার ইচ্ছা মেটাতে। তাই তার বউ শহরে বাসন মাজার কাজ করতে যায়। বাড়ির বাবুদের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে আসে ইলিশ মাছ। এই ব্যাপারটা লোকটি সহ্য করতে পারেনি। কারণ সে দরিদ্র হতে পারে কিন্তু ভিখারি নয়। তাই বউকে শহরে বাসন মাজার কাজ করা বন্ধ করে দেয়।

“ফের যদি শহরে ঢুকিস তাহলে গলা টিপে মারব। সেদ্ধ ভাতে সুখ হবে কিনা বল।”<sup>১৩</sup>

এই শহরই একদিন লোকটাকে তাড়িয়ে দিয়েছে। ‘জঠর’ গল্পে এক প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়ার দিনমজুরি করে জীবন চলে। তাদের দশটি সন্তানকে ঠিক মত ভাত দিতে পারে না। প্রৌঢ় কয়েকদিন ধরে কাজ পায় না। অন্যদিকে প্রৌঢ়ার শরীরে জ্বর থাকায় কাজে যেতে পারেনি। দশটি সন্তানসহ তাদেরকে মুড়ি খেয়ে দিন কাটাতে হয়। প্রৌঢ় তার বোবা ছেলেকে নিয়ে ভবানীর থানের পুকের মাঠে কাজের খোঁজে আসে। সিল্কের পাঞ্জাবি পড়া এক লোক তার জঙ্গলে মুরগি, ছাগল ছানা দেখাশোনা করার জন্য লোক খুঁজে। প্রৌঢ়র ছেলেকে কাজ দিতে চায়। প্রৌঢ় বলে আমাকে কাজে নেন বাবু ও আমার ছেলে। পাঞ্জাবি পড়া লোকটি বলে -

“না তোমাকে শালা এক সের চাল খাওয়াতে হবে আর ও ব্যাটা একপো পারবে না। ও যদি পারে তো আসুক। আমি মিঞার দোকানে আছি। ঠিক দুটোয় জঙ্গলে ফিরব হ্যাঁ।”<sup>১৪</sup>

দুবেলা ভাত আর পনের টাকার আশায় বোবা ছেলেকে জঙ্গলে মুরগি ছাগল পাহারার কাজে পাঠাতে বাধ্য হয়। নয়টি শিশু কন্যাসহ বাপটাও ছেলের দিকে তাকিয়ে থাকে। কেউ বলে দাদা ছাগলের দুধ আনবে, কেউ বলে দাদা মুরগির ডিম আনবে। তাদের কত আশা। কারণ তারা দুবেলা দুমুঠো ভাত ঠিকভাবে খেতে পারে না। তার মা বালককে মুড়ি বাতাসা খাইয়ে পাঠিয়ে দেয়। ধু ধু মাঠ জঙ্গল পেরিয়ে লোকটার ডেরায় আসে। লোকটার শরীরে জ্বর থাকায় সে রাতে ভাত খাবে না। তাই ছেলেটিকেও ভাত না খেয়ে রাতে মুরগি ছাগল পাহারা দিতে হয়। ছেলেটির পেটে তিনদিন ধরে ভাত পড়েনি।

“দু’মুঠো মুড়ি ছাড়া সে কিছুই খায়নি। তার মা বাড়ি বাড়ি বাসন মেজে ভাত নিয়ে আসত থালায় বেঁধে। বাপ কাজ পেলে চরে উনুন জ্বলত। তারা দশ ভাই-বোন সেই ভাত পেতে পুরে রাতে ঘুমত। তিনদিন মা কাজে যায় নি, বাবা কাজ পায় নি। তাই ভাতও নেই পেটে।”<sup>১৫</sup>

লেখক দিন আনা দিন খাওয়া মানুষের চরম দারিদ্রতার পরিচয় দিয়েছেন। উত্তরবঙ্গের তিস্তা ও তার চর, ঘন জঙ্গলকে আঁধার করে সমরেশ মজুমদারের এই যে গল্প-বুনট তা অনবদ্ব। সামাজিক বিভাজন সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের আরো কীভাবে কোণঠাসা ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা নেয় সমরেশ মজুমদারের গল্প না পড়লে বোঝা যায় না।

৫

অভিনব সমাজ ভাবনা সমরেশ মজুমদারের গল্পের একটি অন্যতম দিক। উত্তরবঙ্গের চা-শিল্প সংস্কৃতিতে ব্রিটিশদের অবদান অনস্বীকার্য। উত্তরবঙ্গের চা-সংস্কৃতি বলয়ে একটি সামাজিক বিন্যাস ছিল লক্ষ্য করার মতো। চা-বাগানের কর্মসূত্রে মালিক, ম্যানেজার, কেরানি, শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে বিভাজন স্পষ্ট। অনেকেই মনে করেন ব্রিটিশরাই এই বিভাজনের মূলে। ‘জায়গা’ গল্পে চা-বাগানের তরুণ অ্যাসিস্টেন্ট ম্যানেজার সুজন জিপ গাড়ি থামিয়ে সুধাংশুকে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য গাড়িতে উঠুন বলতেই তিনি জানায় -

“তোমার চাকরিটা হারাতে চাও।”<sup>৩৬</sup>

আসলে সুধাংশুর এভাবে বলার কারণ হল চা-বাগানের ম্যানেজারদের কতগুলি সামাজিক নিয়ম কানুন মেনে চলতে হয়। যেমন - স্ট্যাটাস মেইনটেন করে চলা। কাজের বাইরে কথা বলা যাবে না। ম্যানেজারদের নির্দিষ্ট ক্লাবে আড্ডা মারতে হবে। ছেলেমেয়েদের ডাউহিলে বোর্ডিং-এ রেখে পড়াতে হবে। চা-বাগানে চাকরি সূত্রে বাঙালিদের এই ভাবে জীবনাচরণ করতে হত। এইসব নিয়মের বেড়াজালের মধ্যেও সুজন গভীর রাতে ময়নাগুড়িতে গিয়ে মায়ের সঙ্গে দেখা করে। কারণ প্রকাশ্যে দেখা করলে সুজনের চাকরি চলে যাবে। গত বছর দুর্গাপূজায় অষ্টমীর সকালে সুজনের বউ এক হাত ঘোমটা দিয়ে অঞ্জলি দেয়। সেই ঘটনা চা-বাগানের মালিকের কানে পৌঁছে যায়। যার ফলে সুজনের এক বছর ইনক্রিমেন্ট বন্ধ করে দেয়।

উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং জেলার লেপচা জনগোষ্ঠীর সামাজিক নিয়ম কানুনের পরিচয় পাওয়া যায় ‘জমা জমি’ গল্পে। পাহাড়ের জঙ্গল কেটে আবাদি জমি বের করে ফসল ফলায়। যা সমতলের জমির তুলনায় নিম্নমানের। লেপচা জনগোষ্ঠীর মানুষরা জঙ্গলের পাথুরে জমির উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। মানে লেপচার বয়স পনের ষোল বছর। চার বছর বয়সে বাবা মারা যায়। তখন থেকে বড়দাদাকে বাবার মত মান্য করে। মানেরা চার ভাই। জঙ্গল কেটে কয়েক বিঘা জমি চাষ করে। সেই জমিই পনের জনের পেট চালায়। তাই তারা এই জমিকে রক্তের মত দেখে। পঞ্চাশ বছর বয়সে বড় দাদা মারা যায়। লেপচাদের সামাজিক নিয়ম অনুযায়ী যেহেতু বড় ভাবির কোন সন্তান নাই সেহেতু নয় ভাগের দু’ভাগ জমি বিক্রি করে বাপের বাড়ি চলে যাবে। মানদের কোথায় টাকা যে বড়দা ও বড়ভাবীর ভাগের জমিটুকু কিনে নেবে? অথচ এই জমি তাদের কাছে রক্তের সমান। এই জমি চলে গেলে বাঁচবে কিভাবে? মানে লেপচার বাড়িতে আলোচনা সভা বসে। লেপচাদের সংখ্যা যেহেতু দিন দিন কমে যাচ্ছে তাই জমি যাতে তাদের বেঁধে রাখতে পারে পূর্ব পুরুষরা কিছু আইন করেছিল।

“আমাদের আইনে, ধর্মে যে বিধান আছে তা সবাইকে মানতে বাধ্য। বিধানটি হল যদি স্বামী মারা যায় তাহলে স্ত্রীকে বিবাহ করবে তার সবচেয়ে বড় অবিবাহিত দেওর। সে যদি বিবাহিত হয় তাহলে তার পরের ভাই। যদি কোনও ভাই অবিবাহিত না থাকে তাহলে জেঠা বা কাকার ছেলেদের সঙ্গে ওর বিবাহ হতে পারে।”<sup>৩৭</sup>

মানেরা চার ভায়ের মধ্যে মেজভাই বিবাহিত, সেজভাই পশু বড়ভাবী তাকে বিয়ে করবে না। বড়ভাবীর ইচ্ছা বিয়ে করতে হলে মানেকেই বিয়ে করবে। তাই মানে দাদার সম্মান ও জমি বাঁচার জন্যে চুয়াল্লিশ বছরের বড়ভাবীকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়।

‘জোড়া পা’ গল্পে একদিকে লেখক সমাজের মানুষের ঐক্যবদ্ধতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যদিকে পাপ করলে তার শাস্তি কি হতে পারে সমাজের মানুষকে দেখিয়েছেন। এই গল্পে গরীব জগন্ময়ের টিবির চিকিৎসার জন্য তার পাড়ার বা সমাজের মানুষ সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। জগন্ময়ের জীবন রক্ষা পকল্পের জন্য গ্রামের মানুষ দলে দলে এসে যে

যার সাধ্য মত সাহায্য দেয়। প্রথম দিনে পাঁচশো টাকা চাঁদা উঠে। কিন্তু টিবি হাসপাতাল থেকে ডাক্তার জানায় জগন্ময়ের টিবি ছাড়াও সিফিলিস বা যৌন রোগ আছে। ফলে তার চিকিৎসা এখানে হবে না। গরীব মানুষরা মদ খেয়ে খারাপ পাড়ায় গিয়ে এই রোগ বাঁধিয়ে নিয়ে আসে। সিফিলিস রোগটা বড়লোকের কিন্তু গরীব মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে। এই রোগটাকে সমাজের মানুষ ঘৃণা করে। জগন্ময়ের জীবন রক্ষা প্রকল্প সমাজকে যতটা ঐক্য করে তোলে সিফিলিস রোগ এসে ঠিক ততটাই ঠুনকো করে দেয়। কেউ কেউ টিবির চিকিৎসায় দেওয়া টাকা ফিরত চায়। জগন্ময়কে বস্তিতে রাখতে চায় না। তাই গ্রামের মাথা তারকদা থেকে বন্ধু বান্ধব জগন্ময়কে অস্বীকার করে। কারণ জগন্ময় তাদের ও বউ ছেলেমেয়ে থেকে শুরু করে সমাজের সকল মানুষকে প্রতারণা করেছে। ফলে তাকে শাস্তি পেতে হবে। জগন্ময়ের একদিকে রক্তবমি অন্যদিকে শরীরে লাল লাল দাগ উঠতে শুরু করে। সাধারণ মানুষ সেই শাস্তি নিজের চোখে দেখে শিক্ষা নিক। এই শাস্তি দেখার জন্য মাথা পিছু কুড়ি পয়সা ধার্য করা হয়। সেই টাকা তার পরিবারকে দেওয়া হবে। পরের দিন গাছ তলায় একটি ঘর বানিয়ে জগন্ময়কে সেখানে রেখে মাইকে ঘোষণা করা হয় -

“আসুন আসুন, দলে দলে আসুন, পাপের বেতন কি তা নিজের চোখে দেখে যান। ভগবান কাউকে ছেড়ে কথা বলেন না। এই জীবনে পাপের শাস্তি মরার আগে পেতে হয়। নিজের ছেলেমেয়ে বউকে বধিত করে শুধু লালসা মেটাতে গিয়ে মানুষের কি হাল হয় নিজের চোখে দেখে যান।”<sup>৩৮</sup>

সাধারণ মানুষ দলে দলে এসে চার হাত দূর থেকে জগন্ময়ের দগদগে ঘা দেখে থুতু দিয়ে যায়।

## ৬

সমরেশ মমজুমদারের গল্পে ভাষা ব্যবহারের দিকটি বৈচিত্র্যময়। উত্তরবঙ্গে আর্য, দ্রাবিড়, অষ্ট্রিক, মঙ্গোলীয় জাতি ও ভাষা গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। উত্তরবঙ্গে সর্বাধিক ব্যবহৃত ভাষা বাংলা রাজবংশী ছাড়াও হিন্দি, নেপালি, সাঁতালি, মুণ্ডারি, মেচ, রাভা, তিব্বতি, ভুটিয়া, লেপচা, ইংরেজি ভাষাও ব্যবহৃত হয়। উত্তরবঙ্গে চা-বাগানের কাজের জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন জনজাতির মানুষ এসেছে। এছাড়াও নেপাল ও ভুটানের জনজাতিরা উত্তরবঙ্গে আসে। ফলে উত্তরবঙ্গে ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য দেখা যায়। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন গল্পকার তাদের গল্পে ভাষা ব্যবহারের বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন। আমাদের আলোচ্য গল্পকার সমরেশ মজুমদার তাঁর বিভিন্ন গল্পে উত্তরবঙ্গের ভাষা ও শব্দের ব্যবহার করেছেন। তাঁর গল্পের ভাষা সাবলীল গদ্য ভাষা যা পাঠককে সহজেই আকৃষ্ট করতে পারে। ব্রিটিশ চা-বাগানের মালিকরা ভারতের মধ্যদেশ অর্থাৎ রাঁচি, হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগনা থেকে আদিবাসীদের উত্তরবঙ্গে চা-বাগানের শ্রমিকের কাজ করার জন্য নিয়ে আসেন। এরাই মদেশিয়া নামে পরিচিত। মদেশিয়ারা বাংলা, নেপালি, হিন্দি ভাষার মিশ্রণ ঘটিয়ে নিজস্ব ভাষা গড়ে তোলে। এই প্রসঙ্গে একটি উল্লেখযোগ্য গল্প হল ‘জিয়ানো মাছ’। এই গল্পে গয়েরকাটার চা-বাগানের মদেশিয়া শ্রমিকদের ভাষার ব্যবহার লক্ষণীয়। যেমন -

“ঠিক বাত। খানেকে লিয়ে, আচ্ছা কাপড়াকে লেয়ে, ডেইলি হাঁড়িয়াকে লেয়ে সব কইকো রুপিয়া চাহিয়ে।”<sup>৩৯</sup>

উদ্ধৃতাংশে ব্যবহৃত ‘হাড়িয়া’ শব্দটি হল এক ধরনের নেশা জাতীয় খাবার। যা একমাত্র মদেশিয়ারাই তৈরি করে। ‘জমাজমি’ গল্পে দার্জিলিং জেলায় বসবাসকারী লেপচাদের ভাষার প্রয়োগ লক্ষণীয়। যেমন -

“এ দাজু সবাই তোমাকে খুঁজছে আর তুমি এখানে দাঁড়িয়ে আছ।”<sup>৪০</sup>

উদ্ধৃতাংশে ‘দাজু’ শব্দের অর্থ বড় ভাই বা সম্মান অর্থে ব্যবহার করা হয়। ‘আঙরাভাসা’ গল্পেও উত্তরবঙ্গের অধিবাসীদের ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। যেমন -

“আমারে আবার গার্ভের পোলাটাকে দেখতে যাওন লাগব! খুব অসুখ, বোঝালা, এত কাজ, আর পারি না, বোঝালা।”<sup>৪১</sup>

এছাড়াও কিছু শব্দের ব্যবহার করেছেন। যেমন - সুরত- সুন্দর, ভাতার- স্বামী অর্থে। এই ভাবেই সমরেশ মজুমদার তাঁর গল্পের আঙ্গিক ভাবনায় স্বতন্ত্র হয়ে উঠেন। তাঁর গল্পের বিষয় কখনও উত্তরবঙ্গের চা-বাগান, বনাঞ্চল, নদী আবার কখনও কলকাতার শহুরে জীবন।

উত্তরবঙ্গের নদী, চা-বাগান, বনাঞ্চল বিষয়ক গল্প রচনায় সমরেশ মজুমদার ব্যতিক্রমি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর গল্পে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জনজাতির আর্থ-সামাজিক রূপটি প্রকটিত। তিনি সময় সম্পর্কে একজন সচেতন শিল্পী। তাঁর গল্পে আধুনিকতার ছোঁয়া ও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। ষাটের দশকের শেষ থেকে শুরু করে পঞ্চাশ বছরের অধিক সময় পর্যন্ত তিনি তাঁর লেখনী অব্যাহত রেখেছেন। কলকাতায় বসবাস করলেও প্লট নির্বাচনে তিনি বারবার উত্তরবঙ্গে ফিরে এসেছেন। এবং উত্তরবঙ্গের চরিত্র আখ্যানে এক অন্যতম জীবন রূপকার হিসেবে পরিচিত হয়েছেন।

### Reference:

১. মজুমদার, সমরেশ, সমরেশের সেরা ১০১, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০০৭, নিবেদন অংশ।
২. মজুমদার, সমরেশ, গল্প সমগ্র ১, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ২৭৮
৩. তদেব, পৃ. ২৮০
৪. তদেব, পৃ. ২৮১
৫. তদেব, পৃ. ৫০
৬. তদেব, পৃ. ৬১
৭. মজুমদার, সমরেশ, কথামালা, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০১৯, পৃ. ১২৪
৮. তদেব, পৃ. ১২৫
৯. তদেব, পৃ. ১২৫
১০. ঘোষ, ঋতুপর্ণ (সম্পা), রোববার সংবাদ প্রতিদিন, পৃ. ৮৪
১১. মজুমদার, সমরেশ, গল্প সমগ্র ১, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৯২
১২. তদেব, পৃ. ৯৩
১৩. তদেব, পৃ. ৯৫
১৪. তদেব, পৃ. ২১০
১৫. তদেব, পৃ. ২১৩
১৬. তদেব, পৃ. ২১৫
১৭. তদেব, পৃ. ১৩০
১৮. তদেব, পৃ. ১৩০
১৯. তদেব, পৃ. ১৩৮
২০. মজুমদার, সমরেশ, গল্প সমগ্র ২, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃ. ৭০
২১. তদেব, পৃ. ৭১
২২. তদেব, পৃ. ৭৭
২৩. মজুমদার, সমরেশ, গল্প সমগ্র ১, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৩৬৬
২৪. তদেব, পৃ. ৩৬৭
২৫. তদেব, পৃ. ৩৬৯
২৬. তদেব, পৃ. ৩৭২

- 
২৭. মজুমদার, সমরেশ, গল্প সমগ্র ২, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃ. ২২৭  
২৮. তদেব, পৃ. ২২৮  
২৯. মজুমদার, সমরেশ, গল্প সমগ্র ১, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৯৬  
৩০. মজুমদার, সমরেশ, গল্প সমগ্র ২, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃ. ২৪৭  
৩১. তদেব, পৃ. ২৪৮  
৩২. তদেব, পৃ. ২৫৪  
৩৩. তদেব, পৃ. ২৫৫  
৩৪. তদেব, পৃ. ৩০৮  
৩৫. তদেব, পৃ. ৩১১  
৩৬. মজুমদার, সমরেশ, গল্প সমগ্র ১, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ২৭৯  
৩৭. মজুমদার, সমরেশ, গল্প সমগ্র ২, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃ. ৩১৮  
৩৮. তদেব, পৃ. ৪০৬  
৩৯. মজুমদার, সমরেশ, গল্প সমগ্র ১, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৩৩৯  
৪০. মজুমদার, সমরেশ, গল্প সমগ্র ২, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি ২০২৩, পৃ. ৩১৭  
৪১. মজুমদার, সমরেশ, গল্প সমগ্র ১, পত্রভারতী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০২২, পৃ. ৮৩